স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব

ভূমিকা

ইতিহাসের পাতায় ১৯৯১ সালের ৩১ ডিসেম্বর দিনটি স্মরণীয় হয়ে আছে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্তির দিন হিসেবে। এদিন পুরো বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক নিমিষে বদলে গিয়েছিল মনে করা হয়। বিশেষত, বিশ্বের রাজনৈতিক ভারসাম্যে একটি বদল লক্ষ্য করা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন নিছক কোনো রাষ্ট্রজোটের পতন নয়। এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ সাত দশকের প্রতাপশালী একটি এক পরাশক্তির পতন ঘটেছিল। ১৯৮৯-৯১ সালের এই তিন বছরে পর পর তিনটি নাটকীয় ঘটনা ঘটে যায়। বস্তুত এই ঘটনাগুলোর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ফলাফল বলা যেতে পারে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্বে প্রায় ১৫ টি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের উত্থান ঘটতে দেখা যায়। এরপর বিশ্বের উদীয়মান রাষ্ট্রগুলোকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ যুদ্ধে লিপ্ত হয় আমেরিকা। এর মধ্য দিয়ে বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ লক্ষ করা যায়।

	এ ইউনিটের পাঠে আপনি যা জানতে পারবেন

- ✓ **পাঠ-৮.১** **সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পটভূমি**
- ✓ **পাঠ-৮.২** **সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি**
- ✓ **পাঠ-৮.৩** **বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির প্রভাব**
- ✓ **পাঠ-৮.৪** **সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর পতনের প্রভাব**
- ✓ **পাঠ-৮.৫** **বার্লিন প্রাচীরের অবসান ও একত্রিত জার্মানি**

পাঠ-৮.১ সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পটভূমি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বিশ্বের পরাশক্তি বলতে বোঝাত ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া এসব রাষ্ট্রকে। রাশিয়া তখনও ততটা শক্তিশালী ছিল না। এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে আন্তর্জাতিক সংঘাত থেকে সযত্নে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধজনিত বিধ্বস্ত সামরিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পূর্ব ইউরোপীয় ১৫ টি রাষ্ট্র নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠনের পর থেকেই বিশ্বের রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ লক্ষ করা যায়। এই রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং সংশ্লিষ্ট সংঘাত তথা শক্তি প্রদর্শনের মহড়ার একটা পর্যায়ে এসে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বলশেভিক বিপ্লব সংঘটিত হলে উক্ত বিপ্লবের নেতা লেনিন বিশ্বযুদ্ধ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। এজন্য তিনি ত্রি-শক্তি জোটের প্রধান শরিক জার্মানির সাথে সন্ধির মাধ্যমে পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্র পোল্যান্ডসহ বিভিন্ন বাল্টিক প্রজাতন্ত্রসমূহ, ফিনল্যান্ড এবং ইউক্রেনের অধিকার জার্মানিকে হস্তান্তর করেছিলেন। ককেশাস অঞ্চলের একটা অংশও তিনি তুরস্কের নিকট ছেড়ে দিয়েছিলেন। কমিউনিজমের লাল ফৌজের বিরুদ্ধে জার সমর্থকগণ দক্ষিণ এশিয়ায় এবং সাইবেরিয়ান অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গ সেনাবাহিনী গৃহযুদ্ধ শুরু করলে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী রাশিয়ায় অবতরণ করে 'হোয়াইট আর্মি' কে সহায়তা দান করে। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয় ঘটলে মিত্রবাহিনী তাদের সমস্ত শক্তি রাশিয়ার গৃহযুদ্ধে তথা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করে।

১৯১৯ সালের মধ্যে রাশিয়া ১৬ শতকের দিকে মস্কো নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। পাশাপাশি তাদের বিশাল অঞ্চল বিদ্রোহী হোয়াইটআর্মির' নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। তবে রাশিয়ার কমিউনিস্ট বিরোধী 'হোয়াইট আর্মি' ভৌগোলিকভাবে বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতে চলমান সংঘাতে একের পর এক রাশিয়ার অঞ্চলসমূহ নিজেদের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছেই পরাজিত হতে থাকে। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হলে মিত্রপক্ষ রুশ-জার্মান সন্ধিটি বাতিল করেছিল। ফলে রাশিয়া এ অঞ্চলে তার ছেড়ে দেওয়া দেশগুলো যেন মিত্রপক্ষের পতাকাতলে সমবেত না হয় সেজন্য চেষ্টা চালায়। ফলাফল হিসেবে দেখা যায় এ দেশটি বেলারুশ, ইউক্রেন, আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া প্রভৃতি দেশ জোরপূর্বক দখল করে নিয়ে সোভিয়েত রিপাবলিক গঠন করে।

অন্যদিকে বাল্টিক অঞ্চলের লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়ায় সোভিয়েত রিপাবলিক গঠন অত সহজ ছিল না। কেননা এ অঞ্চল গুলোতে রুশ বিপ্লব এর পর স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। তাছাড়া বিপ্লবের সময় ফিনল্যান্ডে গৃহযুদ্ধ চলায় স্বাধীন ফিনল্যান্ডকে রাশিয়া স্বীকৃতি দিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে পোল্যান্ডের পুনর্জন্ম হয়। তখন এ দেশটি সফলভাবে রাশিয়ার আগ্রাসন মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। ১৯১৯ সালের মার্চে লেনিন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল কমিটি গঠন করে ঘোষণা করেন বিশ্বের যেকোনো স্থানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে এর মাধ্যমে সহায়তা দেয়া হবে। তিনি ভেবেছিলেন যে এর মাধ্যমে শিল্পসমৃদ্ধ দেশ গুলোর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গুলোকে বিপ্লবের দিকে ধাবিত করা সহজ হবে। তখন বেশ দ্রুত সে বিপ্লব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মিত্রপক্ষের সরকারগুলোর প্রবল বাধার কারণে লেনিনের স্বপ্নপূরণ বিলম্বিত হয়েছিল। এরপর ১৯২০ সালের দিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা মিত্রপক্ষীয় দেশগুলোর জনসাধারণকে যুদ্ধ বিমুখ করে তুললে রাশিয়ার গৃহযুদ্ধে তাদের সহায়তা কমে যায়। ১৯২২ সালের মধ্যে সাইবেরিয়া থেকে শেষ মিত্রপক্ষীয় সৈন্যটি অপসারিত হলে পূর্ব ইউরোপের রাশিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত হয়। পাশাপাশি শক্তির মহড়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়া বিশ্বের ক্ষমতাধর পরাশক্তির একটিতে পরিণত হয়।

পাঠ- ৮.২ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি

১৯৪৫ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে শক্তিশালী পিপলস রিপাবলিক গঠিত হয় যারা বিভিন্ন চুক্তির ভিত্তিতে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ রিপাবলিকে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ হলো যুগোস্লাভিয়া, আলবেনিয়া ও বুলগেরিয়া। ১৯৪৮ সালের মধ্যে পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি এবং চেকোস্লোভাকিয়াতে ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। তখন রানী মেলানিন ও জোসেফ স্ট্যালিনের শক্তিশালী শাসনের পর সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট লিওনিদ ব্রেজনেভ তার নতুন ডকট্রিন নিয়ে হাজির হন। ব্রেজনেভের এ নীতি ছিল যদি কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে কমিউনিস্ট পার্টি হুমকির মুখে পতিত হয় তবে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি উক্তদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে। ব্রেজনেভ ডকট্রিন এর সফল প্রয়োগ ঘটানো হয় ১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায়। সেখানে কম্যুনিস্ট পার্টি হুমকির মুখোমুখি হলে সোভিয়েত পুলিশ বুলগেরিয়া এবং চেকোস্লোভাকিয়ায় অবতরণ করে। তারা সেখানে গিয়ে সংস্কারবাদী আলেকজান্ডার দুপের বিদ্রোহ দমন করেছিল তারা।

ব্রেজনেভ ডকট্রিন চেকোস্লোভাকিয়ায় সফল হওয়ার পর ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানেও প্রয়োগ করা হয়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা বেজনেভের অপর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ নীতিই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের জন্য দায়ী। ১৯৭৯ সালের ২৬ ডিসেম্বর সামরিক মহড়ার আড়ালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাহিনী কাবুলে প্রবেশ করেছিল। তারা সেখানে একটি কমুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করে। ক্রমে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্যের উপস্থিতি এক লক্ষ বিশ হাজারে উন্নীত হয়। সোভিয়েত আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগান মুজাহিদিনদের বিপুল অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ করে। তারা আফগান বিপ্লবীদের গোপনে সামরিক প্রশিক্ষণও প্রদান করে। এর ফলে সোভিয়েত সৈন্যের উপস্থিতি সত্ত্বেও কাবুলের কমিউনিস্ট সরকার প্রায় ৮০ শতাংশ প্রত্যন্ত অঞ্চলে তার স্থানীয় প্রশাসন কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়। ১৯৮৪ সাল নাগাদ আফগান মুক্তিযোদ্ধারা এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে সেখানে ভিয়েতনামে মার্কিন বাহিনীর মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়। তারা এক অর্থে নানা স্থানে রুশদের নাকানি-চুবানি খাইয়ে বসে।

১৯৮৫ সালে মিখাইল গর্বাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতায় আসীন হয়ে তার পূর্বসূরি ব্রেজনেভের নীতি পরিত্যাগ করেন। তিনি স্নায়ু যুদ্ধের ভয়াবহতায় ভীত হয়ে এর অবসান কামনা করেন। গর্বাচেভ কর্তৃক ব্রেজনেভ নীতি পরিত্যাগ স্নায়ু যুদ্ধ অবসানের প্রথম ধাপ অতিক্রম করে। তিনি এর অংশ হিসেবে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সালের ১৪ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের যৌথ অনিশ্চয়তায় পাকিস্তান আফগানিস্তানে মধ্যে জেনেভা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এখানে উল্লেখ করা হয় যে ১৯৮৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাবর্তন করবে। গর্বাচেভ এই চুক্তি সাক্ষরের সম্মতি দেন এই বলে যে সৈন্য প্রত্যাহার হতে হবে সম্মানজনক পন্থায়। ১৯৭৫ সালে ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের লজ্জাজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য গর্বাচেভ তার পার্টির এক সভায় এ কথাগুলো উল্লেখ করেন।

আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের ফলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে ছবি ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়। ১৯৮৯ সালে পোল্যান্ডের নির্বাচনের পর সংঘাত শুরু হলে গর্বাচেভ ঘোষণা করেন সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী নয়। ওই একই বছর অক্টোবরের মধ্যে হাঙ্গেরি এবং চেকোস্লোভাকিয়া রাজনৈতিক সমস্যা উপস্থিত হলে গর্বাচেপ পোল্যান্ডে গৃহীত নীতি অনুসরণ করেন। এর ফলে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে ক্রমশ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৮৯ সালের ৯ ই নভেম্বর পূর্ব জার্মানি বার্লিন প্রাচীর খুলে দেয়। তবে তখন পূর্ব জার্মানি ছিল স্নায়ুযুদ্ধের কেন্দ্র। সেই পূর্ব জার্মানি পশ্চিম জার্মানির সাথে একত্রিত হয়ে ন্যাটো জোটে যোগদান করলে স্নায়ুযুদ্ধের প্রথম পর্বের দ্বিতীয় নাটকটি মঞ্চস্থ হয়ে যায়। পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রুশ-মার্কিন স্নায়ুযুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল। এরপর সেখানে সোভিয়েত আধিপত্যের অবসান বাকি থাকলেও সোভিয়েত রিপাবলিকভুক্ত অপরাপর রাষ্ট্রগুলো ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের দিকে ইঙ্গিত করে জনৈক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছিলেন 'সমাজতন্ত্র পোল্যান্ড ১০ বছর, হাঙ্গেরিতে ১০ মাস, পূর্ব জার্মানিতে ১০ সপ্তাহ এবং স্লোভাকিয়ায় ১০ দিনে অদৃশ্য হয়ে যায়'। ১৯৯০ সালে ওয়ারশ প্যাক্ট এর পতন ঘটে। বস্তুত এর ফলেই পাশ্চাত্য শক্তি ইউরোপে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এরপর পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহের পাশাপাশি পারস্য উপসাগরে আধিপত্য বিস্তারের জন্য সেনা মোতায়েন করতে সমর্থ হয়। তখনকার এ সৈন্যবল দিয়েই

ইরাক আক্রমণ সম্ভব হয়। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির মাধ্যমে স্থায়ীভাবে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটেছিল বলে মনে করা হয়।

মিখাইল গর্বাচেভ তার পূর্বসূরি ব্রেজনেভের আগ্রাসী নীতি পরিত্যাগ করে খোলামেলা নীতি ঘোষণা করেন। তার এ নীতি গ্লাসনস্ত নামে পরিচিত। তিনি রাশিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন সংস্কার পরিচালনার জন্য পেরেস্ত্রইকা নামে অপর এক কর্মসূচি শুরু করেন। গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রইকা নীতির ফলে রাশিয়ায় অভ্যন্তরীণ সমস্যা দেখা দেয়। খোলামেলা নীতি গ্রহণের ফলে রুশ জনগণ কমিউনিজমের ত্রুটিগুলো এবং এর ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক দুরবস্থা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা ও মত প্রকাশের সুযোগ পায়। এর ফলে কম্যুনিস্ট পার্টির কঠোর শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে রুশো-এর অন্যান্য রিপাবলিকের জনগণ জেগে উঠে। জনতা অধিক তো স্বাধীনতা প্রত্যাশা করে। এদিকে গর্বাচেভ অর্থনৈতিক সংকটের কারণে তার পেরেস্ত্রইকা কর্মসূচি গতিশীলভাবে এগিয়ে নিতে ব্যর্থ হন। ফলে যে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তা সামাল দেয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ইউনিয়নভুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন হতে চেষ্টা করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ে। এভাবে ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই ১৫ টি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠন করে। এরপর গর্বাচেভ এবং তার অনুসারীর একটি শিথিল ফেডারেশন এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীনে এনে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রয়াস নেন। কিন্তু ১৯৯১ সালে আগস্টের সামরিক ক্যু এর ফলে সে সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। ১৯৯১ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর রাত ৭ টা ৩৫ মিনিটে ক্রেমলিনের ছাদে উড়তে থাকা সোভিয়েত ইউনিয়নের পতাকা নামিয়ে ফেলে উড়ানো হয় রাশিয়ান ব্যানার। অতঃপর ৩১ শে ডিসেম্বর এক সরকারি ঘোষণার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির কথা জানান হয়েছিল। সেই সাথে দীর্ঘ চার দশকে রুশ-মার্কিন স্নায়ুযুদ্ধেরও অবসান ঘটে।

পাঠ- ৮.৩ বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির প্রভাব

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে বিশ্ব ব্যবস্থার পুরো চিত্র পাল্টে যায় এবং এ প্রক্রিয়া এখনো ক্রিয়াশীল। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মনে করেন 'সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ছিল বিশ শতকে বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক দুর্যোগ। এর ফলে রাশিয়ার প্রায় ১ কোটি জনগন বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়। বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এর কুফল রাশিয়াকে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত করেছিল। রাশিয়ার জনগণের ব্যক্তিগত সঞ্চয় ধ্বংস হয়ে যায় এবং পুরনো আদর্শগুলো পরিত্যক্ত হওয়ার ফলে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে। পতনের ধাক্কায় আবেগের বশে অসংখ্য প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হয় কিংবা অসতর্কভাবে পুনর্গঠন করা হয়। এর ফলে সমাজের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। গণদারিদ্র স্বাভাবিক চিত্র হয়ে দাঁড়ায়। ব্যাপক দারিদ্র্যের ফলে নানা স্থানে পতিতাবৃত্তির জন্য অসামাজিক পেশা বৃদ্ধি পায়। রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ এ পরিণতির বাইরে বিশ্বব্যাপী তাদের আজ্ঞাবহ দেশগুলোতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন আরো ভয়াবহ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত প্রদান করেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের প্রভাব শুরু থেকেই দৃশ্যমান হয় নানা দেশে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনকাল থেকেই এর প্রভাব বিশ্বকে আন্দোলিত করে যাচ্ছে। পাশাপাশি এর পতনের বহু দশক ধরে তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল অনুভূত হয় বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। বিশ্বের সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনজনিত প্রভাবগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। সেখানে ক. তাৎক্ষণিক প্রভাব খ. সুদুরপ্রসারী প্রভাব কে গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করা যায়। তাৎক্ষণিক প্রভাব হিসেব করতে গেলে প্রথমত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সাথে সাথে বিশ্ব দ্বিমেরু বিশিষ্ট রাজনৈতিক পরাশক্তি বলের বিভক্তি থেকে একক পরাশক্তি বলে রাজনৈতিক বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রবেশ করে। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মোকাবেলা করার জন্য কোন আদর্শ কোন দেশ বা সংস্থার অস্তিত্ব আর রইল না।

দ্বিতীয়ত, পূর্ব ইউরোপে শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। ন্যাটোর প্রভাব অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয় এবং সোভিয়েত প্রভাব বিলুপ্ত হওয়ায় পূর্ব ইউরোপ বাল্টিক অঞ্চল প্রভৃতি স্থানে মোতায়েনকৃত বিপুল মার্কিন সৈন্য ও সরঞ্জাম সেখান থেকে মধ্যপ্রাচ্যে পুনঃ মোতায়েনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

তৃতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিকভাবে লাভবান হলেও অর্থনৈতিকভাবে এখনো পর্যন্ত পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়নি। এ সুবিধাটুকু চীন গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। ফলে চীন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তর অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিচ্ছে। সম্প্রতি চীন বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

চতুর্থত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন শক্তিশালী হয়। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র সংযুক্ত হওয়ায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক জোন তৈরি করেছে। বেশ কিছুদিন ধরে তারা অভিন্ন মুদ্রা ইউরো প্রচলন করেছে যা অত্যন্ত শক্তিশালী মুদ্রা হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃতি আদায় করতে সমর্থ হয়েছিল। অন্যদিকে রাশিয়ার কাঁচামাল, সস্তা শ্রম আর স্যাটেলাইট সহযোগিতার ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন অর্থনীতির নতুন দ্বার উন্মোচিত করেছিল তার উন্মেষপর্বে। তবে সময়ের আবর্তে তারাও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের বেরিয়ে আসা তথা ব্রেক্সিটের মধ্যে দিয়ে একে নানামুখী দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয়েছিল।

পঞ্চমত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে সবচেয়ে সুবিধা হয়েছে চীনের। চীন একদিকে সোভিয়েত মডেলের সমাজতন্ত্রের বদলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। অপরদিকে তার সমাজতান্ত্রিক পার্টি শৃংখলায় সামান্যতম শিথিলতা প্রদর্শন করেনি। তারা চীনে কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে বলে আর্থিক দিক থেকেও লাভবান হয়।

ষষ্ঠত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে মধ্য এশিয়ায় কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। মস্কো অতীতে তার মধ্য এশীয় মুসলিম দেশগুলোর দ্বারা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে চলত। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে সে ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। এর ফলে বিশ্বের নানা স্থানে মুক্তিকামী রাষ্ট্রগুলোতে বিভিন্ন সম্প্রদায় বিদ্রোহ করে বসে। সিংহভাগ মুসলিম দেশ এই বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়লে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা এদের চিহ্নিত করে ইসলামিক টেররিস্ট গ্রুপ হিসেবে।

অন্যদিকে সোভিয়েতক ইউনিয়ন পতনের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের মধ্যে ছিল বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব এর মধ্যে প্রথমেই বলা যেতে পারে ইস্টার্ন সোভিয়েত ব্লকে জাতীয়তাবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের কথা। এর ফলে জাতিগত সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মুক্তিকামী বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, চেসনিয়া ও জর্জিয়ায় বিপ্লব শুরু হয়। সেখানে জাতিগত সংঘাত এখনো ক্রিয়াশীল।

এর বাইরে প্রথমত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন আর সমাজতন্ত্রের পতন সমার্থক নয় বলেই অনেকে মনে করেন। কেন না চীনে এখনো সমাজতন্ত্র বিদ্যমান। অদূর ভবিষ্যতে একক পরাশক্তি মার্কিন তাবেদারিতে বিরক্ত হয়ে বিশ্বের দেশে দেশে সমাজতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন ঘটবে বলে অনেকে মনে করছেন।

দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভব ঘটায়। এরফলে বিশ্বব্যাপী দেশে দেশে বৈদেশিক নীতি পরিবর্তিত হয়। এর ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতি, রাজনীতি ও মার্কিন মূল্যবোধ প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকে।

তৃতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির স্থলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি দ্রুত অনুসৃত হতে থাকে। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে সহনীয় করার জন্য ক্রান্তিকাল পার করার প্রয়োজন ছিল। অতি দ্রুত পুঁজিবাদী অর্থনীতির দিকে ধাবিত হওয়ায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। এর ফলে বহু বিত্তশালী ব্যবসায়ী রাতারাতি দরিদ্র হয়ে যায়। পাশাপাশি বহু শিল্প-কারখানা বিকল হয়ে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়।

চতুর্থত, গর্বাচেভ তার পেরেস্ত্রইকা দ্বারা সোভিয়েত সিস্টেমে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যে সিস্টেম কে নির্মাণ করা হয়েছিল পরিবর্তনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে টিকে থাকার জন্য সে সিস্টেমকে কিভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব পেরেস্ত্রইকা নীতি তা করতে পারেনি। তার আলোকে সোভিয়েত সমাজে পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয় গর্বাচেপের নীতি। পাশাপাশি প্রচলিত ব্যবস্থাটির সঙ্গে সংঘাত দেশটিকে পঙ্গু করে ফেলে। এর ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশাপাশি তার মদদপুষ্ট সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অর্থনীতিও বিপর্যস্ত হয়।

পাঠ-৮.৪ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর পতনের প্রভাব

ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর পতনের মধ্য দিয়ে বিশ্ব ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে প্রায় চার দশক ধরে চলমান স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং একক পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্থান ঘটে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পতনের পর এসব দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পরিত্যক্ত হয়ে গৃহীত হয় বাজার অর্থনীতি। কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা একটি আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে রাতারাতি অন্য একটি ব্যবস্থাপনায় ঢেলে সাজানো মোটেই সহজ ছিল না। এর প্রমাণস্বরূপ ১৯৯০ সালের পর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে ব্যাপক অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা। এসব দেশে জীবন যাত্রার মান হঠাৎ করেই সোভিয়েত আমল থেকে নিম্নগামী হয়ে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে দেশগুলোর মুদ্রামান কমে যাওয়ার ফলে সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। এসব দেশে সামাজিক স্তরবিন্যাস এ ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। বিধ্বস্ত অর্থনীতির চাপে ক্ষেত্রবিশেষে তাদের নৈতিক মূল্যবোধও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বেশিরভাগ সাবেক সোভিয়েত রাষ্ট্র ১৯৯০-৯১ সময়কালে বাজার অর্থনীতিতে স্থানান্তরের ক্রান্তিকাল অতিক্রম করে। এর ফলে ১৯৯০-৯৫ সময়কালে তাদের জাতীয় উৎপাদন গড়ে ৪০ ভাগ কমে যায়। জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে এই নিম্নগামীতা ১৯৩০ সালের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহামন্দার সময় ছিল মাত্র ২৭ ভাগ। সরকারি অর্থের ব্যয় ব্যবস্থাপনা পরিবর্তনের ফলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক কার্যক্রমে ব্যাপক প্রভাব পড়ে আরেকদফা দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়। তবে বাজার সংস্কার কর্মসূচি অব্যাহত থাকায় ধীরে ধীরে দেশগুলোর জাতীয় উৎপাদন দুই দশকের মধ্যে পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরে আসে। ধীরে ধীরে এ দেশগুলোর জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেতে থাকলে তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দান করে। ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমন্বিত বাজার বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ বাজারে পরিণত হয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের অভিন্ন অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অভিন্ন মুদ্রা ইউরো চালু করেছিল। সম্প্রতি এই ইউরোর দরপতনের ফলে ইউরোপের অনেক দেশ সংকটের মুখে পড়েছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর পতনের ফলে প্রাথমিকভাবে বিশ্বের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন এসেছিল তা থেকে এখনও উত্তরণ ঘটানো যায়নি। স্নায়ু যুদ্ধকালীন সময়ে স্নায়ুযুদ্ধের কেন্দ্র ছিল পূর্ব ইউরোপ। পরবর্তীকালে সেই কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় গিয়ে স্থির হয়েছে। শুধু তাই নয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পতনের পর সাম্রাজ্যবাদের নতুন সংজ্ঞা তৈরি হয়েছে।

পাঠ-৮.৫ বার্লিন প্রাচীরের অবসান ও একত্রিত জার্মানি

পশ্চিমাবিশ্ব বার্লিন প্রাচীরকে একটি সময় নাম দিয়েছিল ফ্যাসিবাদবিরোধী প্রতিরক্ষা দুর্গ। পশ্চিম জার্মানি এবং পূর্ব জার্মানিকে বিভক্তকারী এ প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ১৫৫ কিলোমিটার। ১৯৬১ সালে পূর্ব জার্মানির জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক সরকার এ প্রাচীর নির্মাণ করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্র শক্তি জার্মানিকে চারটি অংশে বিভক্ত করেছিল। ফ্রান্স, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই চারটি অংশ অধিকার করে নিয়েছিল। এ সময় জার্মানির রাজধানীকেও বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয়। পূর্ব বার্লিন কে কেন্দ্র করে জার্মানির পূর্বাংশে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। অপরদিকে পশ্চিম জার্মানিতে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও ইংল্যান্ড কমিউনিস্ট শাসনের প্রসার রোধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা চালায়। বিশেষত, ১৯৪৮ সালে লন্ডন সম্মেলনে একত্রিত হয়ে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করে যে সমগ্র জার্মানির জন্য ঐক্যবদ্ধ একটি সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত মিত্রশক্তি অধিকৃত পশ্চিম জার্মানিতে জার্মান গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করা হবে। তখন এই জার্মানির রাজধানী করা হয় 'বন' শহরকে।

অন্যদিকে জার্মান গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হওয়ায় পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে রুশ অধিকৃত অঞ্চল নিয়ে গঠন করা হয় হয়েছিল আরেকটি ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক। শুধু তাই নয় ১৯৪৮ সালে সোভিয়েত সরকার হঠাৎ পশ্চিম বার্লিনের সাথে সংযোগকারী সড়কপথ রেলপথ এবং খালের উপর দিয়ে পশ্চিম জার্মানির অধিবাসীদের যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিল। এর ফলে পশ্চিম বার্লিনের ২ মিলিয়ন মানুষের জীবন সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে। মিত্রপক্ষ এ বিপুল জনগোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য বিমানের মাধ্যমে খাদ্য অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ অব্যাহত রাখে। প্যাশাপাশি সংকট নিরসনের জন্য নানাভাবে কূটনৈতিক তৎপরতা চলতে থাকে। এ অবস্থায় প্রায় ১১ মাস অবরোধ জারি রাখার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

হঠাৎ করে পরিস্থিতি বদলে যেতে থাকে। বিশেষ করে মিত্র পক্ষের উদ্যোগে পশ্চিম জার্মানিতে বিকাশ লাভ করে মুক্ত গণতন্ত্র। সেখানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিপরীতে পূর্ব জার্মানিতে ছিল সমাজতন্ত্রের নামে রাশিয়ার স্বার্থ সিদ্ধির উপযোগী কঠোর শৃঙ্খলা। এই পরিস্থিতি আঁচ করে পূর্ব জার্মানি থেকে মানুষ পশ্চিম জার্মানিতে পালিয়ে যেতে শুরু করে। অন্যদিকে পশ্চিম জার্মানি থেকে পূর্ব জার্মানিতে সমাজতন্ত্র বিরোধী প্রচারণা-প্রপাগান্ডা অব্যাহত থাকে। তখন সমাজতন্ত্রের নামে রাশিয়ার সার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে রাশিয়ার সরকার বার্লিন শহরের মাঝ দিয়ে একটি ইটের দেয়াল নির্মাণ করে। এ দেয়াল নির্মাণের পূর্ব সময়কালে পূর্ব জার্মানি থেকে প্রায় ৩ দশমিক পাঁচ মিলিয়ন মানুষ পশ্চিম জার্মানিতে অভিবাসী হয়েছিল। ১৯৬১ সালে দেয়াল নির্মাণের পর এ ধরনের অভিবাসন কঠোরভাবে বন্ধ করা হয়। ১৯৬১-১৯৮৯ সময়কালে প্রায় ৫০০০ পূর্ব বার্লিনের মানুষ পশ্চিম জার্মানিতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাদের মধ্যে ৬০০ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের এ হত্যাযজ্ঞ থেকে নারী-পুরুষ-শিশু কেউই রেহাই পায়নি।

এই সব দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বার্লিন প্রাচীর হয়ে উঠেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন রক্ষার জন্য নামধারী সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের বিভেদ চিহ্ন। ১৯৮৯ সালে পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে পোল্যান্ডে রাশিয়ার আধিপত্যবাদের পতন ঘটে। সোভিয়েত গর্বাচেভ সরকার এসব দেশে অস্ত্র প্রয়োগ করার নীতি পরিত্যাগ করলে তার প্রভাব পড়েছিল জার্মানিতেও। ফলে পূর্ব জার্মানির সরকারও রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পশ্চিম জার্মানির সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এর অংশ হিসেবে পূর্ব জার্মান সরকার ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর ঘোষণা করেছিল যে পূর্ব জার্মানির সব নাগরিক নিজের ইচ্ছামত পশ্চিম জার্মানি ও পশ্চিম বার্লিনে প্রবেশ করতে পারবে। এর ফলে দলে দলে লোক বার্লিন প্রাচীর টপকে পশ্চিম জার্মানিতে গমন করে। পশ্চিম জার্মানির জনগণ তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। উৎফুল্ল জনতা পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বার্লিন প্রাচীরের অনেকাংশ নিজেদের উদ্যেগে ভেঙ্গে ফেলেছিল। তারপর নভেম্বর ঘোষণার পর পূর্ব জার্মান সরকার বার্লিন প্রাচীরের মধ্যে আরও দশটি পথ প্রাচীর ভেঙে উন্মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত অনেকগুলো নতুন পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় বার্লিন প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে। এরপর ১৩ ই জুন ১৯৯০ থেকে পূর্ব জার্মান সেনাবাহিনী বার্লিন প্রাচীর ভেঙে ফেলতে শুরু করে। ১৯৯১ সালের নভেম্বরের শেষ নাগাদ এ প্রাচীর ভাঙার কাজ সমাপ্ত হয়। পাশাপাশি উৎসুক জনতা এই প্রাচীরের অনেকাংশ নিজের উদ্যোগে গায়েব করে দিয়েছিল। ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর বার্লিন প্রাচীর উন্মুক্ত করার মধ্য দিয়েই শুরু হয় দুই জার্মানি একত্রীকরণ প্রক্রিয়া। তবে ৩ অক্টোবর জার্মানি একত্রীকরণ দিবস হিসেবে পালিত হয়।

সারাংশ

স্নায়ু যুদ্ধের পরবর্তী ধাপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলা যেতে পারে সোভিয়ে ইউনিয়নের পতনকে। এরপর বিশ্বের নানা দেশে বিদ্যমান রাজনীতির মেরুকরণে একটি বদল লক্ষ করা যায়। বিশেষত, যে দেশগুলোতে রাশিয়ার প্রভাব ছিল বেশি তারা স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অন্যদিকে কেউকেউ পতনের পরেও রাশিয়ার উপর আস্থা রাখতে গিয়ে অনেকটাই কোণঠাসা হয়ে পড়ে। রাশিয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার পরেও অনেক দেশ শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। বিশেষ করে এসব দেশ সন্ত্রাসবাদের মদদ দিচ্ছে এমন অযুহাতে সেখানে যুদ্ধ শুরু করে আমেরিকা। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটলে এক পর্যায়ে এসে ভেঙ্গে দেয়া হয় বার্লিন প্রাচীর। তারপর নতুনভাবে একত্রিত হয় জার্মানি। তাদের পতাকা এবং সংবিধান নতুনভাবে নির্ধারিত হয়।